ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

দিপু রায়, মো. গোলাম মোস্তফা ও মো. রবিউল ইসলাম

১৮ ডিসেম্বর ২০১৮

চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
মো. গোলাম মোস্তফা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
মো. রবিউল ইসলাম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

বিশেষ সহযোগিতায়
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মহুয়া রউফ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মনজুর -ই- খোদা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, শাহনূর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মো. মোস্তফা কামাল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মোঃ শহিদুল ইসলাম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, অমিত সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার

কৃতজ্ঞতা
চা বাগানের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং বাংলাদেশীয় চা সংসদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য এবং চা শ্রমিকগণ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ, ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ওয়াহিদ আলমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক আবদুল আহাদ, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা ও মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫ ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া টিআইবি'র চলমান বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেঞ্জ (বিবেক) প্রকল্পে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের চা শ্রমিকদের সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও এর থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

চা শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার ওপর এই গবেষণায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে চা বাগানের জীবন মান উন্নয়নে সরকার, চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও বিভন্ন এনজিও'র বিভিন্নরকম উদ্যোগের ফলে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্যতম। এখনও তাদের যে দৈনিক মজুরি (প্রাপ্ত সকল সুবিধার আর্থিক মূল্যমান হিসাবে) দেওয়া হচ্ছে তা একই মাপকাঠিতে প্রাক্কলিত দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক কম। আইনগতভাবে তাদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে রাখা এবং তাদের জন্য নির্ধারিত আইনগত অধিকার অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিতে ঘাটতির তথ্যও এই গবেষণায় উঠে এসেছে। তাছাড়া তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারি যে সকল তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির কারণে বৈষম্য ও বঞ্চনা অব্যাহত রয়েছে। চা শ্রমিকদের অধিকার ও কর্মপরিবেশ সংশ্লিষ্ট গবেষণায় চিহ্নিত এসব আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, বিরাজমান চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে চা শিল্পের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে চা বাগান কর্তৃপক্ষ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যদাতা, তদারকি কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মী, এবং অন্যান্য অংশীজনের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক দিপু রায়, মো. গোলাম মোস্তফা ও মো. রবিউল ইসলাম। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই গবেষণায় বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব এর নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সরকারি ও বেসরকারি চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক এবং অংশীজন কর্তৃক চা শ্রমিকদের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা শিল্পর গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে মোট চা উৎপাদন হয়েছে ৭৮.৯৫ মিলিয়ন কেজি এবং জিডিপিতে চা শিল্পের মোট অবদান ১৮২৫.২৫ কোটি টাকা। চা শিল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত মোট চা বাগানের সংখ্যা হচ্ছে ১৬৪টি - যার মধ্যে মূলধারার চা বাগান রয়েছে ১৫৬টি যারা যেখানে আবাসিক শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এই প্রথাগত চা বাগানগুলো মূলত মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটিত জেলাতে অবস্থিত। এ সকল চা বাগানে প্রায় এক ১,২২,৮৪০ জন শ্রমিক রয়েছে - যার মধ্যে ২১৯৯৭ জন শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করছে। এই চা বাগানগুলো ব্রিটিশ আমল থেকে তৈরি করা হয়েছে যেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক এনে কাজ করানো হয়। এসব বাগানে শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানে বসবাস করছে, তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ন্যাজ্য অধিকার রক্ষা ও তাদের সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যা চা শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য। এছাড়া চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকারিভাবে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন শ্রমনীতি, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও শ্রমিক-মালিকের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, রেশন, ভবিষ্য তহবিলসহ বিভিন্ন সুবিধাদি দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে চা শ্রমিকদের জীবন মানে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি, নলকূপের পানি পান করা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, পূর্বের তুলনায় মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি। চা শ্রমিকদের উন্নয়নে এসব ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, সভা সেমিনার ও গণ মাধ্যমে এখনও তাদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে চা শ্রমিকদের সুস্থ কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র চলমান বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেঞ্জ (বিবেক) প্রকল্পে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), শ্রীমঙ্গল (যেখানে দেশের বেশির ভাগ চা উৎপাদন হয়) -এর পরামর্শের প্রেক্ষিতে চা শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করে।

১. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও এর থেকে উত্তরণের মাধ্যমে চা শিল্পের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ঠ উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে - চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; চা শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যমান পরিস্থিতি উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

২. গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় শুধুমাত্র প্রথাগত শ্রমিকদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা বাগানে স্থায়ীভাবে বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানে বসবাস করে, যাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও মজুরি বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়ার নিয়ম রয়েছে এবং যারা মূলত সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলাতে বসবাস করে। চা শ্রমিকদের অধিকার ও কর্ম পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য মজুরি, বাসস্থান, চাকরি প্রাপ্তি, ভাতা, রেশন, সঞ্চয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাসন, শিশু সদন ও বিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই গবেষণায় চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা,

জবাবদিহিতা এবং সীমাবদ্ধতা দেখার জন্য চা বাগানের শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিল অফিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়, চা বাগানের হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ, দলীয় আলোচনা, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে ছিল চা শ্রমিক ও চা শিল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজন। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ও বিভিন্ন চেকলিস্ট টুলস ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ৬৪টি বাগানের (মোট ২২৯টি বাগানের মধ্যে) ১৯১১ জন স্থায়ী শ্রমিকের নিকট থেকে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর পরোক্ষ উৎসের মধ্যে ছিল সংশ্লিষ্ট আইন, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নথি, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টারি ও ওয়েবসাইট। গবেষণার ধারণাপত্র প্রণয়নের সময়ে চা বাগান মালিকদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশীয় চা সংসদের প্রতিনিধিদের সাথে দুই বার মত বিনিময় করা হয়। পরবর্তীতে গবেষণার প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে তাদের সাথে ফলাফল নিয়েও মত বিনিময় করা হয় এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইভাবে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথেও গবেষণার ফলাফল নিয়ে মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

৪. আইনগত সীমাবদ্ধতা

চা বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩ ও ২০১৮), শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধিমালায় চা শ্রমিকদের দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ন্যায্যতা প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রম আইনের ধারা ১১৫ এ ছুটি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, 'প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাবার অধিকারী হবেন' যা চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে উল্লেখ করায় তারা এ ছুটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রম আইন, ধারা ১১৭ (১) এ ছুটি সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো দোকান বা বাণিজ্য বা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, সড়ক পরিবহন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা প্রতি ১৮ দিন কাজের জন্য একদিন অর্জিত ছুটি পাবেন যা চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২২ দিন। আবার শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ধারা ২৬৩ (২) এ উল্লেখ রয়েছে যে, শ্রমিকরা তাদের চাকরি ২ বছর সম্পন্ন করে যেকোনো উপায়ে অবসর নিলে তার জমানো ভবিষ্য তহবিলের টাকার সাথে মালিকের অংশও সম্পূর্ণ পাবে। কিন্তু ধারা ২৯৩ (৩) এ উল্লেখ রয়েছে যে, চা শ্রমিকরা ১০ বছর পূর্ণ করলে তাদের ভবিষ্য তহবিলের নিজের জমানো অংশ ও মালিকের অংশ পুরো পাবেন, এর কম সময় কাজ করলে তা বিভিন্ন হারে কম পাবেন।

অন্যদিকে, আইন ও বিমিালায় কিছু সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে। শ্রম আইন - ধারা ৩২ (১) এ উল্লেখ রয়েছে যে, যেকোনো উপায়ে চাকরির অবসান ঘটলে ৬০ দিনের মধ্যে আবাসন ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু শ্রম বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত হলে এক মাসের মধ্যে আবাসন ছেড়ে দিতে হবে যা আইনের সাথে বিধিমালার সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে। আবার বিধিমালায় আবাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "প্রতি বৎসর বসবাসকারী শ্রমিকের শতকরা অন্তত দশ ভাগ শ্রমিকের জন্য অনুরূপ 'মির্তিঙ্গা টাইপ' গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে"। কিন্তু 'মির্তিঙ্গা টাইপ' এর কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় শ্রমিকরা কোন ধরনের ঘর পাবার অধিকারী হবে তা জানতে পারে না। ফলে তারা অনেক সময় প্লাস্টিকের চালাযুক্ত ঘর নিতেও বাধ্য হয়। বিধিমালায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, "লিখিতভাবে রেকর্ডকৃত সন্তোষজনক কারণে মহাপরিদর্শকের মতামতের ভিত্তিতে সরকার নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকদের জন্য 'মির্তিঙ্গা টাইপ' গৃহ নির্মাণের বিধান শিথিল করিতে পারিবে।" এক্ষেত্রে 'সন্তোষজনক কারণ' কথাটির কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ না থাকা এবং 'মহাপরিদর্শকের মতামতের ভিত্তিতে' কথাটি উল্লেখের মাধ্যমে মালিকদের 'নির্দিষ্ট সংখ্যক' ও 'মির্তিঙ্গা টাইপ' গৃহ নির্মাণ উভয় ধরনের বিষয়গুলোকে শিথিল করা হয়েছে। শ্রম আইনে প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে ৮০% ও কল্যাণ তহবিলে ২০% হারে প্রদান করবে উল্লেখ থাকলেও কোনো বাগানেই তা করা হচ্ছে না। একইভাবে শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বীমা ও গ্র্যাচুইটির কথা শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও এখনও তারা তা পাচ্ছে না। শ্রম বিধিমালার তফসিল ৫ এর - বিধি ৬ (১ ও ২) এ চা শ্রমিকদের ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসার সুযোগ থাকতে হবে বলে উল্লেখ থাকলেও কোন কোন সেবা ও কতটুকু প্রদান করা হবে তার সীমা উল্লেখ না থাকায় শ্রমিকরা অনেক রোগের চিকিৎসা পাচ্ছে না। আবার বিধিমালায় চা বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নির্দিষ্ট

সংখ্যক শয্যা, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, এক্স-রে বিভাগ ও ফিজিক্যাল থেরাপি বিভাগ থাকতে হবে উল্লেখ থাকলেও মহাপরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে এসব সুবিধা না থাকলেও চলবে উল্লেখ করে তা প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে। বিধিমালায় তফসিলে বর্ণিত বিধানসমূহ কার্যকরকরণে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে মালিক লিখিতভাবে মহাপরিদর্শককে অবহিত করবেন উল্লেখ থাকলেও শ্রমিকদের মহাপরিদর্শকের নিকট অভিযোগ করার বিষয়টি উল্লেখ নাই। আবার কুয়ার পানি বিশুদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও বিধিমালায় মালিক কর্তৃক পানীয় জলের সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে টিউবওয়েলের বিকল্প হিসেবে ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়া স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ

চা শ্রমিকগণ দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের তুলনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোনো শ্রমিক অবসর গেলে কিংবা স্বেচ্ছায় চাকুরি ছাড়লে তার পরিবারের একজন অস্থায়ী শ্রমিককে স্থায়ী হিসেবে চাকুরি পাওয়া, বাগানের হাসপাতাল কিংবা ডিসপেনসারী থেকে কর্মরত স্থায়ী শ্রমিক ও তাদের পোষ্যদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক অবসর ভাতা পাওয়া, স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরির ৭.৫% হিসেবে ভবিষ্য তহবিল পাওয়া, ২০ দিন অসুস্থাজনিত ছুটি পাওয়া যা শ্রম আইনে ১৪ দিন এবং ১৪ দিন উৎসব ছুটি পাওয়া যা শ্রম আইনে ১১ দিন, ২ টাকা কেজি দরে রেশন পাওয়া ও একজন স্থায়ী শ্রমিকের জন্য সর্বোচ্চ তিন জন পোষ্যর রেশন পাওয়া ও ৫টি বাগানে বিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে ১৬ই ডিসেম্বর ও ২৬ শে মার্চে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি। এসব ইতিবাচক দিক থাকলেও চা বাগানের শ্রমিকরা এখন বিভিন্ন অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৫.১. চাকরি স্থায়ীকরণ

শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিক তিন মাস সন্তোষজনক শিক্ষানবিশী কাল পার করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার কথা থাকলেও ৬৪টি বাগানের কোনোটিতেই তা মানা হচ্ছে না। মাত্র ১৪টি বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্য থেকে বছরে ১০ থেকে ১২ জনকে সরাসরি স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তার জন্যও শ্রমিকদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী শ্রমিকদের ৬০% সরাসরি ও ৩৯.৪% কে পরিবারের অন্য সদস্যের পরিবর্তে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে ৪৪.২% কে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় যার মধ্যে ৯৪.৪% কে গড়ে ৬ বছর সময় অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জরিপে দেখা গেছে ১৯.৩% উত্তরদাতার খানায় অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত ছিল যারা ছয় মাস থেকে ৪০ বছর ধরে অস্থায়ী হিসেবে কর্মরত আছেন। অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী করলে মজুরিসহ বিভিন্ন সুবিধাদি দিতে হবে বলে তাদের স্থায়ী করা হয় না। শ্রম আইনে শ্রমিকদের স্থায়ী করার সময়ে নিয়োগ পত্র ও আইডি কার্ড দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো বাগানেই তা দেওয়া হয় না। নিয়োগপত্রের বিকল্প হিসেবে সি-ফরম দেওয়ার কথা দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও ৯২.৯% কে কোনো নথি সরবরাহ করা হয়নি।

৫.২. মজুরী

চা বাগানের শ্রমিকদের সর্বশেষ চুক্তিতে দৈনিক মজুরি মাত্র ১০২ টাকা ধরা হয়েছে যা দেশের অন্য খাতের শ্রমিকদের তুলনায় কম। চা শ্রমিকদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ হিসাব করলে দেখা যায় মাসিক সর্বোচ্চ ৫২৩১ টাকা যা বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী জাহাজ ভাঙ্গা (১৬০০০ টাকা), ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিজ (১২৮০০ টাকা), এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল (৮৭০০ টাকা), ফার্মাসিউটিক্যালস (৮০৫০ টাকা), তৈরি পোশাক (৮০০ টাকা), টি প্যাকেটিং (৭০৮০ টাকা), স' মিলস (৬৮৫০ টাকা), অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (৫৯৩০ টাকা) ও কটন ইন্ডাস্ট্রিজ (৫৭১০ টাকা) এর তুলনায় কম। আবার ক্যাশ প্লাকিং, নিরিখের অতিরিক্ত পাতা তোলা ও অতিরিক্ত কর্মঘন্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ মজুরি দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো বাগানেই তা দেওয়া হয় না। এছাড়াও ৬৪টি বাগানের মধ্যে ২৮টি বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীদের সমান মজুরি দেওয়া হয় না যা শ্রম আইনের লঙ্ঘন।

৫.৩. পাতার ওজনকরণ ও কর্মঘণ্টা

৬৪টি বাগানের মধ্যে অধিকাংশ (৫৬টি) বাগানে অ্যানালগ কাটার মেশিনে পাতার ওজন করা হয় ও মেশিনের ওজন পরিমাপের নির্দেশক একমুখী হওয়ায় তা শ্রমিকদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না। তবে ৮টি বাগানে পাতার ওজনকরণে ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার করা

এবং ওজনের পরিমাণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা। কোনো শ্রমিক ওজনের পরিমাপ নির্দেশক কাটা দেখার চেষ্টা করলে বাবু তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং কেউ কাটা দেখতে একটু জোর করলে তাকে পরবর্তীতে বিভিন্ন উপায়ে অলিখিত শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেমন - সবচেয়ে দূরের স্থানে কাজে পাঠানো, নজরদারি বাড়ানো, সামান্য ভুলে বকা দেওয়া ইত্যাদি। জরিপ কালীন সময় থেকে পূর্বের এক সপ্তাহের পাতা উত্তোলনের হিসাব যারা বলতে পেরেছে (৬০.৩%) তাদের মধ্যে ৬১.৩% শ্রমিক বিভিন্ন অজুহাতে পাতার ওজন কম দেখানোর কথা বলেন। এদের মধ্যে ৯২.৬% শ্রমিক গামছার ওজনের অজুহাতে দৈনিক গড়ে ২.৯ কেজি, পরিবহনের সময় পাতা পড়ে যাওয়ার অজুহাতে ৮.২% শ্রমিককে দৈনিক গড়ে ২.৪ কেজি, বৃষ্টি হলে পাতার ওজন বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে ৭২.৬% শ্রমিককে দৈনিক গড়ে ৪.১ কেজি এবং কোনো কারণ ছাড়াই ১৮.০% শ্রমিককে দৈনিক গড়ে ২.০ কেজি চা পাতা কেটে রাখা হচ্ছে। এই হিসেবে জরিপের সময় থেকে বিগত এক সপ্তাহে সকল চা বাগানে সকল বাগানের মোট শ্রমিকদের (১ লক্ষ ৮৪৩ জন) পাতা উত্তোলনের ভরা মৌসুমে দৈনিক ১০২ টাকা হিসাবে সপ্তাহে ৩১ লক্ষ ২ হাজার ৪৩৫ টাকার সমমানের পাতা কেটে রাখা হয়।

৫.৪. কাজের পরিবেশ

শ্রম বিধিমালায় প্রত্যেক চা বাগানের কাজের জায়গায় (যাকে 'সেকশন' বলা হয় যেখানে শ্রমিকরা পাতা উত্তোলন ও অন্যান্য কাজ করে) পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও কোনো বাগানেই স্থায়ী ব্যবস্থা যেমন নলকূপ বা কুয়ার ব্যবস্থা নেই। ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৪৪টি বাগানে একজন শ্রমিক শ্রমিকদের কাজের জায়গায় পানি সরবরাহ করার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। তবে ২১টিতে নলকূপের পানি সরবরাহ করা হয় এবং ২৩টি বাগানে প্রবাহমান ছড়া/ঝরনা/কুয়া/নদী/খাল থেকে অস্বাস্থ্যকর পাত্রে পানি সংগ্রহ করে শ্রমিকদের দেওয়া হয় যা শ্রমিকরা হাত পেতে পান করে। তাদের পানি খাওয়ার জন্য কোনো গ্লাস দেওয়া হয় না। পানি সরবারহের কাজ করে এমন শ্রমিকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, শ্রমিকরা যেখানে কাজ করে, বিশুদ্ধ পানির উৎস থেকে তা অনেক দূরে হওয়ায় ঘাড়ে করে অতদূর থেকে পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তারা নিকটস্থ ছড়া বা খাল থেকে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। শ্রম বিধিমালায় শ্রমিকের ব্যবহারের জন্য প্রতি সেকশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও কোনো বাগানেই তা নেই। একইভাবে শ্রমিকদের কাজের জায়গায় বিশ্রামাগার থাকার বাধ্যবাধকতা বিধিমালায় উল্লেখ থাকলেও বেশিরভাগ বাগানেই তার ব্যবস্থা নাই। ফলে বৃষ্টির সময়ে বা অন্য কোনো কারণে বিশ্রামের প্রয়োজন হলে বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হয় না।

৫.৫ শ্রমিক নিরাপত্তা

চা শ্রমিকদের বাগানে কাজ করার সময় সাপ, জোঁক ও বিষাক্ত পোকার আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে চা বাগানে ওষুধ বা চুন ছিটানোর জন্য বার বার অনুরোধ করলেও অধিকাংশ বাগান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় না। যেসব সেকশনে এসব সাপ, জোঁক ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব খুব বেশি, সেসব সেকশনে কাজ করতে যাওয়ার সময় শ্রমিকরা নিজ উদ্যোগে শরীরে কেরোসিন মেখে যায়। বৃষ্টির সময় জোঁকের উপদ্রব মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। তখন কাজ করতে গেলে অনেক সময় জোঁক কানে বা শরীরে পর্যন্ত ঢুকে যায়। আবার কীটনাশক ছিটানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের (১৯.৮%) স্বাস্থ্যগত ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মাস্ক, গ্লাভস বা জুতা, চশমা, টুপি ইত্যাদি বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়ার নিয়ম থাকলে ৫৭.০% শ্রমিকদের বাগান থেকে কিছুই দেওয়া হয় না। ফলে এই কীটনাশক ও অন্যান্য ওষুধ শরীরে সরাসরি লাগার কারণে শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগে ভুগতে হয়।

৫.৬. ছুটি

অধিকাংশ চা বাগানের শ্রমিকরা বছরে সর্বোচ্চ ২০ দিন পর্যন্ত অসুস্থতাজনিত ছুটি নিতে পারে। তবে এই ছুটি নেওয়ার জন্য বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বরত ব্যক্তির কাছ থেকে অসুস্থতাজনিত প্রতিবেদন নিতে হয়। এই অসুস্থতার প্রতিবেদন নেওয়ার জন্য অনেক সময় অসুস্থ শরীর নিয়ে দায়িত্বরত ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়, যা কষ্টসাধ্য ও অমানবিক। জরিপ চলাকালীন সময় থেকে গত পাঁচ বছরে ১২.০% খানায় কমপক্ষে একজন স্থায়ী নারী শ্রমিক গর্ভধারণ করেছেন যার মধ্যে ১০.০% খানার শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পান নি এবং যারা মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ১০.০% খানার শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়ে মজুরি পান নি। মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার পূর্বের তিন মাসে প্রাপ্ত মজুরির গড় হিসেবে মাতৃত্বকালীন মজুরি পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক বাগানেই ওই সময়ের হাজিরা (৮৫ টাকা) হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়।

৫.৭ উৎসব ভাতা

চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক বিগত বছরে কমপক্ষে ২৫০ দিন কাজ করলেই কেবল ১০০% উৎসব ভাতা পাবে অন্যথায় কম উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে উৎসব ভাতা কেটে রাখা হয়। জরিপে দেখা যায় যারা উৎসব ভাতা পেয়েছে (৯৮.৩%) তাদের মধ্যে ৪৪.৯% শ্রমিক অনুপস্থিতির কারণে বিভিন্ন হারে উৎসব ভাতা কম পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বাবুদের ঠিকমত হাজিরা না তোলা, শ্রমিকদের জন্য কোনো সার্ভিসবুক চালু না থাকা এবং শ্রমিকদের কাজের দিনের হিসাব ঠিকমতো রাখতে না পারায় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের অনুপস্থিত দেখিয়ে তাদের উৎসব ভাতা কম দেয়।

৫.৮ রেশন

শ্রমিকদের সাথে বাগান কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী পরিবারের সর্বোচ্চ তিনজন পোষ্য বাবদ রেশন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ৬১টি বাগানের মধ্যে ৬টি বাগানে পোষ্যদের রেশন দেওয়া হয় না। জরিপে দেখা যায় যারা রেশন পায় (৮৫.৮%) তাদের মধ্যে ১৮% উত্তরদাতা সব সময় এবং ২৬% উত্তরদাতা মাঝে মাঝে ওজনে কম দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। যারা ওজনে কম দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তাদের গড়ে ৬২৯ গ্রাম রেশন কম দেয় এবং রেশন কম দেওয়ার পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০০ গ্রাম থেকে সর্বোচ্চ ১৪০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে যে যাদের নামে জমি বরাদ্দ আছে তাদের বিভিন্ন হারে রেশন কম দেওয়া হবে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি কিয়ার (৩০ শতাংশ) জমির জন্য বছরে একজন শ্রমিকের ১৫০ কেজি রেশন কেটে নেওয়া হয়। প্রতি কেজি রেশনের (আটা) সর্বনিম্ন দাম ১৬ টাকা হলে বছরে ২৪০০ টাকা বাগান কর্তৃপক্ষ কেটে নেয়। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারকে বছরে ১ কিয়ার জমির জন্য খাজনা দিচ্ছে মাত্র ৯০ টাকা। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৬৮.৯% শ্রমিক জানান যে বাগান থেকে যে রেশন দেওয়া হয় তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটে না। রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে একটি বৈষম্য বিদ্যমান। নারী স্থায়ী শ্রমিক হলে স্বামীকে পোষ্য হিসেবে রেশন দেওয়া হয় না কিন্তু পুরুষ স্থায়ী শ্রমিক হলে স্ত্রীকে পোষ্য হিসেবে রেশন দেওয়া হয়।

৫.৯. আবাসন

শ্রম বিধিমালায় বাগান মালিক কর্তৃক সকল শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য বিনামূল্যে বাসগৃহের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ৩২ হাজার ২৯৯ জন স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য আলাদা কোনো আবাসন বরাদ্দ করা হয় নি। এছাড়া অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্যও কোনো আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। জরিপে দেখা গেছে, ৬৮.২% শ্রমিকের আবাসন বাগান কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ প্রদান করেছে। ২১.৭% শ্রমিকের আবাসন এনজিও বা ইউনিয়ন পরিষদ বা নিজে তৈরি করে নিয়েছে যেখানে বাগান মালিকের কোনো অবদান নেই। আর ১০.১% শ্রমিকের আবাসন আংশিক মালিক দিয়েছে এবং আংশিক শ্রমিক নিজ খরচে তৈরি করেছে। বেশিরভাগ বাগানে যে নতুন ঘর দেওয়া হচ্ছে তাতে বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে ঘরের চালের জন্য শুধু টিন আর কাঠ দিলেও বেড়া ও দরজা-জানালা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ বেড়া ও দরজা-জানালা বাবদ ৫০০০ টাকা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ৯০.৬% আবাসন একটি মাত্র কক্ষসম্পন্ন যার মাঝ বরাবর কোনো বেড়া নেই, যেখানে মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ছেলের বৌসহ গরু-ছাগল নিয়েও বসবাস করতে হয়। তবে ৩টি বাগানে কর্তৃপক্ষ কলোনির আদলে ২ কক্ষ বিশিষ্ট কিছু নতুন আবাসন তৈরি করেছে, যেখানে শৌচাগারেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

আবার বিধিমালায় বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের বাসগৃহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা থাকলেও অধিকাংশ বাগানে দেখা যায়, দীর্ঘ দিন পুরোনো হওয়ায় ঘরগুলো মেরামতের প্রয়োজন হলেও তা করা হচ্ছে না। বছরে মেরামতের প্রয়োজনযোগ্য সর্বোচ্চ ১০% - ২৫% ঘর মেরামত করা হয়। জরিপে দেখা গেছে ৭০.৯% শ্রমিকের ঘর বাগান কর্তৃপক্ষ মেরামত করে দেয় এবং ২২.৮% শ্রমিক নিজ খরচে মেরামত করে নেয় এবং বাকি ৪.২% শ্রমিক জানায় কর্তৃপক্ষ টাকা দিলে তারা নিজেরা মেরামত করিয়ে নেয়। তবে বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘর মেরামত করানোর জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণত বাগান কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরে কম পক্ষে এক মাস থেকে বছরের পর বছর সময় অপেক্ষা করতে হয়। বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেহেতু ঘর মেরামত করতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় সেহেতু শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই তাদের ঘরগুলো মেরামত করে নেয়। একজন শ্রমিকের মতে, 'বছর পার হয়ে গেল টিন ফুটো হইছে, বৃষ্টিতে দেয়াল ভিজে ফাটল ধরছে, পঞ্চায়েতকে বললাম, ছোট সাহেবকে বললাম, বড় সাহেবকে বললাম কেউ আমলে নেয় নি। দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে মারা গেলে তারপর সাহেবরা এসে ঘর মেরামত করে দেবে।'

৫.১০ আবাস স্থলে আলোর ব্যবস্থা

জরিপে দেখা গেছে, চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ৪৮.৪% শ্রমিক বিদ্যুৎ, ২৭.৯% কেরোসিন ২৩.৪% শ্রমিক তাদের ঘরে সোলারের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করে। বিধিমালায় মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের বাসগৃহ ও আবাসিক এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ থাকলেও অনেক বাগানে বিদ্যুতের লাইন স্থাপনের জন্য সরকারকে প্রদেয় ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করে না। কোনো কোনো বাগানে থাম থেকে বাগান পর্যন্ত বিদ্যুতের লাইন স্থাপন করার ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করলেও শ্রমিকদের আবাসনে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল শ্রমিককেই দিতে হয়। বাগানে শ্রমিকরা নিজ নামে মিটার আনতে পারে না। বিদ্যুৎ বিল বাগানের মূল মিটারের নামে আসে যা শ্রমিকরা দেখতে পারে না। কোনো কোনো বাগানে শ্রমিকদের নামে সাব মিটার দেওয়া হলেও সে মিটার অনুসারে বিল নেওয়া হয় না, প্রকৃত বিলের তুলনায় বেশি নেওয়া হয়। সাধারণত একটি বাতি জ্বালিয়ে ৩০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত বিল পরিশোধ করতে হয়। যেসব বাগানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে শ্রমিকদের নিজ খরচে বা এনজিও কর্তৃক সোলার ও কেরোসিনের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করতে হয় যেখানে মালিকদের কোনো ভূমিকা নেই।

৫.১১ আবাস স্থলে খাবার পানি সরবরাহ

জরিপে দেখা গেছে ৭২.৫% শ্রমিক টিউবওয়েল, ১৬.১% শ্রমিক কুয়া ও ৯.৫% শ্রমিক সাপ্লাইয়ের পানি পান করে। নিয়ম অনুসারে বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমপক্ষে ২৫টি পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ বা ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়ার ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৫টি বাগানে কোনো নলকূপ নাই। কোনো কোনো বাগানে প্রায় ১৫০টি পরিবারের জন্য একটি নলকূপ রয়েছে। কোনো কোনো বাগানের আবাসনে বাগান কর্তৃপক্ষ পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা করেনি। তারা শুধুই কুয়ার পানির উপরে নির্ভরশীল। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে কুয়ার পানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর, ঘোলাটে, এগুলোর কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা বা ঢাকনা নেই, কুয়াগুলো এমন নিম্ন জায়গায় অবস্থিত যে তার পানি সুরক্ষা করাও সম্ভব নয়, বৃষ্টি হলেই বিভিন্ন ময়লা কুয়ার পানিতে ঢুকে যায়, কোনো কোনো কুয়ার মধ্যে ব্যাঙসহ বিভিন্ন পোকা-মাকড় বাস করে। অন্যদিকে যেসব বাগানে সাপ্লাইয়ের পানি ব্যবহার করা হয় তার কোনো কোনোটিতে সব সময় পানি সরবরাহ করা হয় না। সকালে এক ঘণ্টা ও বিকেলে এক ঘণ্টা মাত্র পানি দেওয়া হয়। এমনও দেখা গেছে কোনো কোনো বাগানে দিনের পর দিন পানি সরবরাহ থাকে না।

৫.১২ আবাসনে শৌচাগারের ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর (৫) নম্বর ধারা অনুসারে, প্রত্যেক বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের আবাসিক সুবিধার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা করবেন। তথ্যদাতাদের মতে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৪৬টি বাগানে বাগান মালিক কখনো কোনো শৌচাগারের ব্যবস্থা করেনি। জরিপে দেখা গেছে ৭৪.৯% উত্তরদাতা শৌচাগার ব্যবহার করে এবং ২৫.১% কোনো শৌচাগার বা টয়লেট ব্যবহার করে না। তারা খোলা জায়গায় তাদের প্রক্ষালনের কাজ সম্পন্ন করে। যারা জানিয়েছেন শৌচাগার ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে ৫৫.৪% উত্তরদাতা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করে না। যেসব উত্তরদাতা শৌচাগার ব্যবহার করে, তাদের ৭৪.৯% শৌচাগার নিজে তৈরি করেছে। মাত্র ১৭.৮% শৌচাগার বাগান কর্তৃপক্ষ তৈরি করে দিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বাকি ৭.৪% শ্রমিকের শৌচাগার এনজিও বা ইউনিয়ন পরিষদ বা প্রতিবেশী তৈরি করে দিয়েছে। শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে চা শ্রমিকদের পূর্বের অনিহা দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। আর যারা শৌচাগার ব্যবহার করে তাদের মধ্যে ৪৪.৬% শ্রমিক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করেন বলে উল্লেখ করেন। সম্প্রতি সরকার চা বাগান এলাকায় □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□।

৫.১৩ শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা

বিধিমালা অনুসারে চা শ্রমিকদের সন্তানদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি বাগানে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু ৬৪টি বাগানের মধ্যে মাত্র ২৪টি বাগানে বাগান কর্তৃপক্ষের স্কুল রয়েছে, ৪০টি বাগানে বাগানের কোনো স্কুল নেই, ৩২টি বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩০টি বাগানে এনজিও বিদ্যালয় রয়েছে এবং ৬টি বাগানে কোনো স্কুলই নেই। জরিপে দেখা গেছে ৫১.৪% পরিবারে ছয় থেকে ১২ বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে রয়েছে যার মধ্যে ৮৪.২% ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়। যারা স্কুলে যায় তাদের মাত্র ২১.৫% বাগানের স্কুলে যায়। অন্যান্য ৭৮.৫% ছেলে-মেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এনজিও স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে যায়।

বাগানের স্কুলগুলোতে এক বা দুইটি কক্ষে পাঁচটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একজন শিক্ষক দ্বারা পাঠদান করানো হয়। বেশিরভাগ শিক্ষকদের অস্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় দৈনিক ভিত্তিতে বেতন দেওয়া হয়। এসব স্কুলগুলোতে বসার পর্যাপ্ত বেঞ্চ, বিদ্যুৎ, আলমিরা বা কোনো আসবাবপত্র ও খেলার মাঠ নেই, সরকার প্রদত্ত বই ছাড়া কোনো শিক্ষা উপকরণও নেই, পড়ালেখার মান ভাল না হওয়ায় অভিভাবকরা শিশুদের সরকারি কিংবা এনজিও স্কুলে পাঠায়। তবে ৫টি বাগানে কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যারা নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে বেতন পান। সম্প্রতি সরকার কিছু বাগানের স্কুলকে সরকারিকরণ ঘোষণা করলেও এসব স্কুলের অবকাঠামোতে তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। বাগানের স্কুলের শিক্ষার্থীরা সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি পায় না।

৫.১৪ চিকিৎসা

বিধিমালা অনুযায়ী প্রতিটি বাগানে একটি করে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু জরিপকৃত ৬৪টি বাগানের মধ্যে ১১টি বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র বা ডিসপেনসারি নাই। একইভাবে উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র বা ডিসপেনসারিতে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ দুই ধরনের চিকিৎসা সেবা থাকার কথা বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ৪১টি বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা নাই। ৫৩টি চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে খণ্ডকালীন এমবিবিএস ডাক্তার রয়েছে ১৭টিতে, ৭টি তে মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ৪৫টিতে ড্রেসার, ৪২টিতে কম্পাউন্ডার, মিডওয়াইফ ৩১টি তে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী রয়েছে ৪১টি তে। কোনো কোনো বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র বলতে ছোট্ট একটি মাটির ঘর, যেখানে মাঝে মাঝে কম্পাউন্ডার এসে অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই। যেসব বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র আছে তাদের মধ্যে ৩২টিতে বেড আছে ও ২১টিতে কোনো বেড নাই। বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রে যেসব বেড রয়েছে তার বেশির ভাগেরই অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বেশির ভাগ বেডগুলো নোংরা, কোনো কোনো বেডে কভার নাই, অধিকাংশই ভাঙ্গা যেখানে রোগীদের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাখা হয় কিন্তু ভর্তি করানো হয় না। বেশির ভাগ চা বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবার কোনো ব্যবস্থা নাই। ডেলিভারি বা গুরুতর চিকিৎসার জন্য শ্রমিকদেরকে অন্য হাসপাতালে রেফার করলে খরচ বাগান কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে বলে পার্শ্ববর্তী কোনো সরকারি হাসপাতাল বা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার মৌখিক পরামর্শ দেওয়া হয়। বাগানের ডিসপেনসারী থেকে ঘুরে ফিরে সকল রোগের জন্য নাপা বা প্যারাসিটামল জাতীয় একই ওষুধ দেওয়া হয়। আবার হাসপাতালের কম্পাউন্ডার বা চিকিৎসক বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট যে পরিমাণ ও মানের ওষুধের চাহিদা দেয় কর্তৃপক্ষ তার তুলনায় কম ও নিম্ন মানের ওষুধ সরবরাহ করে।

জরিপের তথ্য অনুসারে ৭৫.৪% শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছে যাদের ২১.৯% ডাক্তার, ৪৭.৬% কম্পাউন্ডার, ১৬.৮% নার্স/ধাত্রী ও ১৩.৭% অন্যান্যদের নিকট থেকে সেবা নিয়েছে। বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে যারা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৩৮.৩% সেবাগ্রহীতা প্রয়োজনীয় সকল ওষুধ পেয়েছে, ৫১.৮% আংশিক ও ৯.৯% সেবাগ্রহীতা কোনো ওষুধ পায়নি। ৬১.৭% শ্রমিককে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়েছে যাদের ৭৯.১% সেবাগ্রহীতার কোনো খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করেনি। জরুরি কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বাগানের ডিসপেনসারি বা হাসপাতাল থেকে নিযুক্ত চিকিৎসক বাড়িতে এসে চিকিৎসা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ৩৬.৩% শ্রমিক জরুরী প্রয়োজনে তা পায়নি। আবার যারা (৩৬.৯%) বাগানের বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে মাত্র ২৭.১% শ্রমিককে বাগানের চিকিৎসা প্রদানকারী রেফার করেছিল বলে বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছে। বাকি ৭৩% শ্রমিক বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসা ভাল না হওয়া, ডাক্তার না থাকা, ভাল ওষুধ না পাওয়া ও বাগানে চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার কারণে বাইরের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। আর যারা বাইরে চিকিৎসা নিয়েছে তাদের ৭০% বাগান থেকে কোনো চিকিৎসা খরচ পান নি, ১১.৫% আংশিক এবং ১৭.৮% শ্রমিক পুরো খরচ বাগান থেকে পেয়েছিল। তবে ৪টি বাগানের শ্রমিকদের বাগানের বাইরে চিকিৎসা গ্রহণের সময় বাগানের পক্ষ থেকে কম্পাউন্ডার/ ড্রেসার নিজে তাদের সাথে থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং চিকিৎসার সামগ্রিক খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করেন। যারা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন তাদের মধ্যে ৩৪.৭% উত্তরদাতা বাগানের চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবায় অসন্তুষ্ট।

৫.১৫ ভবিষ্য তহবিল ও অবসর ভাতা

শ্রম বিধিমালায় চাকরিতে এক বৎসর পূর্ণ করেছে এমন প্রত্যেক শ্রমিককে ভবিষ্য তহবিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ১১.৬% কর্মরত স্থায়ী শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে ২৮.৫% জানান যে তাদের বাগানে ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা নেই, ১০.৪% মালিকের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে ও ৮.৬% বাবুদের গাফিলতির কারণে শ্রমিকের

ভবিষ্য তহবিলের নাম অন্তর্ভুক্ত করেনি বলে উল্লেখ করে। আবার যেসব স্থায়ী শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলে অন্তর্ভুক্ত তাদের ১৭.৭% জানে না যে তাদের টাকা নিয়মিত জমা হয় কি না। আবার বিধিমালায় শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ জমানোর একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত বিবরণী বছর শেষে শ্রমিকদের নিকট সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও ১৩.৪% তথ্যদাতাকে কোনো নথি সরবরাহ করা হয়নি। যাদের নথি সরবরাহ করা হয় তাদের মধ্যে ৮৬.৬% শ্রমিককে এক বছর পর পর নথি সরবরাহ করা হয়। বাকিদের দুই অথবা তিন বছর পর পর নথি সরবরাহ করা হয়। শ্রমিকদের মতে বছর শেষে বা দুই তিন বছর পরে নথি সরবরাহ করার কারণে তাদের পক্ষে হিসাব রাখা বা জানা সম্ভব হয় না যে তাদের ভবিষ্য তহবিলের টাকা সঠিকভাবে জমা হয় কি না। অন্যদিকে ভবিষ্য তহবিল কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ভবিষ্য তহবিলের টাকা সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে বাগান কর্তৃপক্ষের জমা দেওয়ার কথা থাকলেও সকল বাগানের মধ্যে মোট ২৭টি বাগানের টাকা দীর্ঘ দিন ধরে ভবিষ্য তহবিল অফিসে জমা দেওয়া হয়নি। এরকম দুইটি বাগানে ভবিষ্য তহবিলের ১.৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আবার জরিপে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে যাদের খানায় অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক আছে (১৭.১%) তাদের ৯০.৫% শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ পেয়েছিল যাদের প্রায় সকলকে গড়ে ১.৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক ১৫ বছর স্থায়ী হিসেবে কাজ করলে সে অবসরের পরে সপ্তাহে মাসিক শ্রমিকদের ১০০ টাকা এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকদের ৬০ টাকা হিসেবে অবসর ভাতা পাবেন। কিন্তু জরিপে দেখা গেছে ৪৮.৫% অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক অবসর ভাতা পায় নি।

৫.১৬ বিনোদন ব্যবস্থা

বিধিমালা অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে বিনোদন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৩১টি বাগানে বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে। তবে এই বিনোদন কেন্দ্র বলতে ব্রিটিশ আমলে তৈরিকৃত একটি নাচ ঘর, যা মূলত পূজা মন্ডপ হিসেবে বা কীর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। টিনের চাল বিশিষ্ট কোনো বেষ্টনী ছাড়া এ নাচ ঘরে মূলত বিভিন্ন পূজা পার্বণে আগে যাত্রাপালার আয়োজন করা হত। বর্তমানে দু-একটি বাগানে তা চালু থাকলেও বেশির ভাগ বাগানে সে ব্যবস্থা নেই। এসব নাচ ঘরে কোনো অভ্যন্তরীণ বিনোদনের সরঞ্জাম নেই। তবে ৯টি বাগানের নাচঘরে ক্যারাম বোর্ড ও টিভি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। ৪৮টি বাগানে খেলার মাঠ রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ২৭টি বাগানে কিছু কিছু বহিস্থঃ বিনোদন ব্যবস্থা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে ৫টি বাগানে ১৬ই ডিসেম্বর ও ২৬শে মার্চ (বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস) উৎযাপনের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ অল্প কিছু অর্থ দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা বিজয়ী হয় তাদেরকে বাগান কর্তৃপক্ষ পুরস্কার হিসেবে সস্তা বাটি ও গ্লাস বা অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করে থাকে।

৫.১৭ ক্ষতিপূরণ

চাকুরি চলাকালে তা থেকে উদ্ভুত দুর্ঘটনার ফলে যদি কোনো শ্রমিক শরীরে জখমপ্রাপ্ত হন বা মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে মালিক তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু বেশির ভাগ বাগানে তা দেওয়া হয় না। কখনও কখনও ক্ষতিপূরণ হিসেবে সামান্য অর্থ প্রদান করে থাকে যা আইনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের তুলনায় অনেক কম। কখনও কখনও ক্ষতির পরিমাণ বেশি হলে বাগান কর্তৃপক্ষ ক্ষতির পরিমাণ কম দেখাতে চায়। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় - একজন শ্রমিকের হাত কাটা পড়লেও তার এই অঙ্গহানির জন্য আইনে উল্লিখিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়নি, কারখানায় কর্মকালীন এক শ্রমিকের হাতের আঙ্গুল কাটা পড়লেও কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি এবং একজন নারী শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চোখটি নষ্ট হলেও তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

৫.১৮ শিশুসদন

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য শিশু সদন, শিশুদের দেখাশোনার জন্য একজন মহিলা, বাচ্চাদের জন্য দুধ বা নাস্তা এবং উপযুক্ত খেলনা ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করার নিয়ম থাকলেও ৬৪টি বাগানের মধ্যে মাত্র ৭টিতে এই শিশু সদন রয়েছে এবং ১০টিতে ব্রিটিশ আমলের জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে কিন্তু কোনো কার্যক্রম নাই। আর ৪৭টিতে কোনো শিশুসদন নাই। অর্থাৎ ৫৭টি বাগানে শিশুসদনের কোনো কার্যক্রম নাই। তথ্যদাতাদের মতে ২০ থেকে ৩০ বছর আগে শিশুসদন চালু থাকলেও এখন আর তা নাই। যেসব বাগানে শিশুসদন চালু রয়েছে তার মধ্যে শৌচাগার রয়েছে ২টিতে, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে ৬টিতে, দুধ ও নাস্তা দেওয়া হয় ৬টিতে, খেলনা রয়েছে ৪টিতে। শিশু সদন না থাকায় যেসব নারী শ্রমিকদের বাচ্চা দেখার মতো

বাড়িতে কেউ নেই তারা কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কিংবা তাদের দীর্ঘ সময় কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এমন অনেক নারী শ্রমিক রয়েছে যারা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার জন্য দীর্ঘসময় কাজে যেতে পারেনি বলে তাদের স্থায়ী শ্রমিক থেকে অস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে।

৫.১৯ বাগানে পৌঁছানো ও ভিতরের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বেশির ভাগ চা বাগানের অবস্থান প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং সমতল এলাকা থেকে অনেক দূরে হওয়ায় এর যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রেই ভাল নয়। কোনো কোনো বাগানে পৌঁছানো খুবই কষ্টকর। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৩৯টি বাগানে পৌঁছানোর রাস্তা ভাল, ৮টি বাগানে পৌঁছানোর রাস্তা মোটামুটি, ১৭টি বাগানে যাওয়ার রাস্তা খুবই খারাপ। আবার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে শ্রমিকদের কলোনি বা বাড়ি-ঘরের ভিতরকার বেশির ভাগ বাগানের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব নাঁজুক। ২৫টি বাগানের ভিতরে প্রকৃত অর্থে কোনো রাস্তা নাই। এসব বাগানের ঘরগুলো টিলার ওপরে অবস্থিত। এখানে এক টিলা থেকে আরেক টিলায় যেতে কখনও কখনও পানিও পার হতে হয়। ১৭টি বাগানে কিছু পাকা রাস্তা ও কিছু কাঁচা রাস্তা দেখা যায়। ১৫টি বাগানের ভিতরের সম্পূর্ণ রাস্তা কাঁচা এবং বর্ষায় কাদা হয়। তবে ৭টি বাগানের ভিতরকার রাস্তা পাকা বলে তথ্য পাওয়া যায়।

৫.২০ অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা এবং সমাধান

সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকরা সঠিকভাবে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না পেলে কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে তা পঞ্চায়েত অথবা ভ্যালি সভাপতি সংশ্লিষ্ট বাগানের ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ তা সমাধানের চেষ্টা করবে। জরিপের সময় থেকে গত এক বছরে ১৯.২% শ্রমিক বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করেছে যার মধ্যে মাত্র ৩৮.০% অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে। ৫৮.২% অভিযোগের সমাধান হয়নি এবং ৩.৮% অভিযোগ চলমান রয়েছে। তবে অভিযোগ দায়েরের বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি, অভিযোগ করে সমাধান না পাওয়া এবং এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত শ্রম আদালতটি চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা অভিযোগ করে না বা করতে আগ্রহবোধ করে না।

৫.২১ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা

দেশের বঞ্চিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী হিসেবে চা শ্রমিকরাও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। জরিপের তথ্য মতে, ১১.৮% পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বয়স্ক ভাতা (৭২.৫%) ও বিধবা ভাতা (১১.৯%)। ব্যাংকের মাধ্যমে এসব ভাতার টাকা দেওয়া হয় বলে ভাতার টাকা প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হয় না। তবে যাদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানের সম্পর্ক ভালো তাদের এইসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজ। এছাড়াও সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন *চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন* নামক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৫ হাজার টাকা সমমূল্যের খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রী বিতরণের প্রকল্প চালু রয়েছে, যার আওতায় ৫৭.৬% তথ্যদাতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বিতরণকৃত খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রীর মান খারাপ ছিল এবং যে পরিমাণ দ্রব্যাদি দেওয়ার কথা ছিল তার থেকে কম দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

৫.২২ শ্রমিক নির্যাতন ও তাদের সাথে অবমাননাকর আচরণ

গবেষণায় নারী শ্রমিকরা কোনো ধরনের শারীরিক বা যৌন হয়রানিমূলক আচরণের শিকার হন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ১% (১৭) জন উত্তরদাতা জানান যে নারী শ্রমিকদের সাথে বাবুরা খারাপ ব্যবহার করে, খারাপ ভাষায় কথা বলে, এলাকার অন্যান্য পুরুষ শ্রমিকরা যৌন নির্যাতন করে, তাদের বিভিন্নভাবে বিরক্ত করে ও স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে বিভিন্ন সময়ে নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলেও সামাজিক অবস্থা ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা প্রকাশ করা হয় না। এছাড়া বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সাথে বিভিন্ন অবমাননাকর আচরণ করে থাকে বলেও গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাগানের ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজারের সামনে কোনো শ্রমিক বা পঞ্চায়েত সভাপতির চেয়ারে বসতে না পারা, তাদের সামনে টুপি পরতে না পারা এবং ম্যানেজার কর্তৃক তুই করে কথা বলা ও শ্রমিক কর্তৃক জুতা পড়ানো ও খোলা উল্লেখযোগ্য।

৫.২৩ মাদকাসক্ত পরিবেশ

বর্তমানে বাগানে মদের ব্যবহারের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ব্যবহার কিছুটা কমলেও এর ব্যবহার অবসান হয়নি। প্রায় প্রতিটি বাগানে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান (পাট্টা) রয়েছে। এই দোকানকে ঘিরে বাগানে আরো অনেক অবৈধ মদের দোকান গড়ে উঠেছে। বাগান সংলগ্ন বাঙ্গালী, এমন কি বাগানের শ্রমিকরা এসব অবৈধ ও ক্ষতিকর মদের ব্যবসার সাথে জড়িত। পুরুষ শ্রমিকরা তলব পাওয়ার দিনেই তাদের মজুরির একটি বড় অংশ মদ খাওয়ার পিছনে ব্যয় করে। ফলে তাদের যেমন আর্থিক সচ্ছলতা ব্যাহত হয় তেমনি তাদের পরিবারের উপরেও একটি নেতিবাচক প্রভাব পরে।

৫.২৪ তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বে অবহেলা ও দুর্নীতি

কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকের ওপরে চা বাগানের শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে নিয়মিত বাগান পরিদর্শনের দায়িত্ব থাকলেও তাদের বেশির ভাগই তা সঠিকভাবে করে না। বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা করে তাদের অনেকেই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে। প্রতি পরিদর্শনে তারা বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা আদায় করে থাকে। কোনো কোনো বাগানে তাদের যেতেও হয় না, তাদের নিকট সরাসরি টাকা পৌঁছে যায়। কখনও কখনও কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনে গেলেও তারা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষকে কোনো প্রশ্ন তোলে না, বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না। পরিদর্শনে আসার বিষয়ে বাগান ম্যানেজারদের জানানো হলেও শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষের কাউকে জানানো হয় না এবং শ্রমিকদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চায় না।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৬.১ তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপ-শ্রম পরিচালক (ডেপুটি ডিরেক্টর অফ লেবার - ডিডিএল), মৌলভীবাজার ও উপ-মহা পরিদর্শক, শ্রীমঙ্গল কার্যালয়

তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে জনবল সংকট অন্যতম। উপ-শ্রম পরিচালক, মৌলভীবাজার কার্যালয়ে ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদের মধ্যে ১০টি এবং উপ-মহা পরিদর্শক (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল -ডিআইজি) - কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রীমঙ্গল শাখার মোট ১৭টি পদের মধ্যে ৫টি পদ শূন্য। জনবলের অভাবে এই কার্যালয়গুলো সঠিকভাবে বাগান পরিদর্শনের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আবার বেশিরভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাবান এবং তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের খুব কাছাকাছি থাকায় তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাগণ তাদের চাপে সঠিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে ভয় পায়।

৬.২ শ্রম আদালত ও ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়

বেশির ভাগ চা বাগান সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু এই অঞ্চলে চা শ্রমিকদের অভিযোগ করার জন্য কোনো শ্রম আদালত নেই। তাদের জন্য নির্ধারিত শ্রম আদালতটি চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় স্বল্প আয়ের চা শ্রমিকদের পক্ষে চট্টগ্রামের শ্রম আদালতে গিয়ে অভিযোগ জানানো সম্ভব হয় না। আবার ভবিষ্য তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ডটি মালিক পক্ষের ৩ জন, শ্রমিক পক্ষের ৩ জন যার একজন কর্মকর্তা পর্যায়ের ও ২ জন নিরপেক্ষ সদস্যসহ মোট ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এখানে নিরপেক্ষ সদস্যগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীরব থাকেন এবং শ্রমিক পক্ষের কর্মকর্তা বেশির ভাগ সময় মালিক পক্ষে ভোট দেওয়ার কারণে শ্রমিক পক্ষের তুলনায় মালিক পক্ষের ভোট বেশি হয় যা বিভিন্ন সময় শ্রমিক স্বার্থ ব্যহত করে। এছাড়া ভবিষ্য তহবিল অফিসের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ না হওয়া এবং শ্রমিকদের জন্য হাতে লেখা নথি সরবরাহ করায় সে হিসাব সঠিক আছে কি না তা শ্রমিকদের বোঝার সুযোগ নাই।

৬.৩ বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন চা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে দর কষাকষি করাসহ তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে। তবে এই ইউনিয়নের নেতাদের বেশিরভাগেরই শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালাসহ শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় বাগান কর্তৃপক্ষের মত প্রভাবশালীদের সাথে দর কষাকষিতে অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল হয় না। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটি চূড়ান্তকরণে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকদের অসংখ্য বার ঢাকায় এসে সভা করতে হয় যা শ্রমিকদের পক্ষে ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। সর্বশেষ চুক্তির জন্য ইউনিয়নের নেতাদের ২২ বার ঢাকায় আসতে হয়েছে। চুক্তি করার জন্য একটানা কোনো সময় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দিতে চায় না। অন্য কাজ আছে বলে প্রতিবারে ১ থেকে ২ ঘন্টা সময়ের বেশি সভায় বসতে চায় না। সভা করার জন্য বাগান মালিকরা নিজেরা না বসে তাদের কর্মকর্তাদের সাথে সভা করতে বসান। বিভিন্ন বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ

হয়ে মালিকদের নিকট থেকে সিদ্ধান্তের জন্য সময়ক্ষেপণ করে। একইভাবে বাগান কর্তৃপক্ষের মতে, চুক্তি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কখনও কখনও শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ায়ও চুক্তি স্বাক্ষরে দেরি হয়ে থাকে।

৬.৪ অন্যান্য সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় দেখা গেছে, চা বাগানের শ্রমিকদের বাগানে কিংবা চা কারখানায় কাজ করার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না। বিশেষ করে যেসব শ্রমিক চা কারখানায় কাজ করে তাদের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি চালিয়ে কাজ করতে হয়। এসব যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ ছাড়া কাজ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। একই ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে তথ্য না জানার কারণে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হতে পারছে না। ফলে তারা তাদের অধিকার আদায়েও দাবি উত্থাপন করতে পারে না।

৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, গত এক দশকে চা শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষা, শৌচাগার ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতির কারণে সামগ্রিকভাবে তারা এখনও দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। তাদেরকে আইনগতভাবেই বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ফলে তাদের মজুরি, ছুটি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাসস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্যতাই তৈরি হয় না যা তারা দাবি করতে পারে। তাছাড়া আইনগতভাবে প্রাপ্য অধিকার থেকেও চা শ্রমিকরা রয়েছে বঞ্চিত। সকল সুবিধা দেওয়ার নামে তাদের দৈনিক যে মজুরি দেওয়া হয় তা দেশের অন্যান্য খাতের মজুরির তুলনা অনেক কম। ফলে শত বছর ধরে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে না। তাদের নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতির কারণে দিনের পর দিন বাধ্য হচ্ছে চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করার চক্রের মধ্যে। তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে তারা জনবল স্বল্পতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাবে চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে অধিকার আদায়ে দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দর কষাকষি করতে পারছে না । সর্বোপরি চা শ্রমিকদের আইনগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতসহ সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাগান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ আরো আন্তরিক হলে চা শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি চা শিল্প আরো লাভজনক অবস্থানে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। চা বাগানের শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে এসব চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

৮. সুপারিশ

১. সরকার ও বাগান মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের অনুমতি সাপেক্ষে একটি যৌক্তিক, ন্যায্য এবং অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে; প্রতি দুই বছর পর পর তা বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হালনাগাদ করতে হবে। যেসব শ্রমিক কারখানায় ও কীটনাশক ছিটানোসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকবে তাদের জন্য ন্যায়সংগত বাড়তি মজুরি ও ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া তাদের এসব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পোশাক, গ্লাভস ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. আইন, বিধিমালা ও সমঝোতা স্মারকের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে -

- অস্থায়ী শ্রমিকদেরও স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় সমান মজুরি প্রদান
- সকল শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গের জন্য বিধিমালায় নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা; বাগানের বাইরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচ ও তা শ্রমিককে প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা শ্রমিকের চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রকার খরচ করা;
- প্রতিটি চা বাগানে শিশুদের জন্য শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত শিশুসদন নিশ্চিত করা, যাতে চা শ্রমিকদের শিশুরা নিরাপদে থাকতে পারে এবং চা শ্রমিকরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে;
- সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সকল স্থায়ী শ্রমিকের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা, দীর্ঘ দিনের পুরাণ ও জরাজীর্ণ ঘর অপসারণ করে দ্রুত নতুন ঘর নির্মাণ করা; প্রদেয় ঘরের ধরন (পাকা দেয়াল ও টিনের চাল) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিধিমালায় উল্লেখ ও তা কার্যকর করা;

- সমঝোতা চুক্তি অনুসারে মালিক কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যায় নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি পরিবারের জন্য নিজস্ব মিটারের ব্যবস্থা করা ও দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় শ্রমিকের নামে আলাদা বিল প্রেরণ;
- প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার;
- শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান;
- মর্নিং ও ক্যাশ প্লাকিং তথা অতিরিক্ত পাতা তোলা বা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান;
- প্রতিটি সেকশন, আবাসন ও কাজের জায়গায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেক স্থায়ী শ্রমিককে নিয়োগপত্র দেওয়া এবং নিয়ম অনুসারে সার্ভিস বুক সংরক্ষণ করা;
- শ্রম আইন অনুযায়ী অস্থায়ী শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় পর স্থায়ী করা; দীর্ঘকাল অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরও একই কাজে আরও এক বছর শিক্ষানবীশকাল রাখা বন্ধ করা;
- সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী নম্বরগুলোতে জোঁক ও পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- গর্ভধারণ মাসের পূর্বের তিন মাসের গড় মজুরি হিসাব করে মাতৃত্বকালীন মজুরি প্রদান;
- গ্রুপ বীমা চালুকরণ;
- চা শ্রমিকদের জন্য দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে।

৩. সমঝোতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের আলোচনা শেষ করতে হবে এবং চুক্তি নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, যাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর করা যায়

৪. উত্তোলনকৃত পাতার ওজন কম দেখানো বন্ধ করতে প্রতিটি বাগানের প্রতিটি সংগ্রহ কেন্দ্রে উভয়মুখী ডিসপ্লে সমৃদ্ধ ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শ্রমিকরাও পাতা মাপার সময়ে পরিমাণ দেখতে পারে। তাছাড়া চা পাতা ওজন এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করতে হবে। পাশাপাশি সকল বাগানের জন্য গামছা, পরিবহণ ও বৃষ্টিজনিত কারণে পাতা কেটে রাখা বন্ধ করতে হবে

৫. ভবিষ্য তহবিল অফিসের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করতে হবে এবং প্রতিমাসে শ্রমিকের টাকা জমার বিষয়ে মুঠোফোন বা এ জাতীয় সহজলভ্য কোনো মাধ্যমে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে নিয়ম অনুসারে অবসর গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ভবিষ্য তহবিলের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৬. বাগানগুলোতে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যকর পরিদর্শন বাড়াতে হবে। পরিদর্শনের প্রতিবেদনের অনুলিপি বাগান কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নকেও প্রেরণ করতে হবে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত আইনের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৭. বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সার্বজনীন শিক্ষার সরকারি নীতি অনুযায়ী সকল চা শ্রমিকের সন্তানের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যে স্থাপিত হাসপাতালের অবকাঠামোর পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতসহ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে। বাগান পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে।

৮. জমি লীজ দেওয়ার একটি নিয়ম বা আইন তৈরি করতে হবে। শ্রমিকদের রেশনের পরিবর্তে জমি দেওয়া বা জমি বরাদ্দের বিপরীতে রেশন কেটে রাখার নিয়মটি বন্ধ করতে হবে।

৯. শ্রমিকদের সহজ অভিগম্যতার জন্য সিলেট অঞ্চলের চা বাগান সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে একটি শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে;

১০. চা শ্রমিকদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং আইন সম্পর্কে সচেতন করতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত সদস্য ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. চিকিৎসাকেন্দ্রে বিদ্যমান সকল ওষুধের একটি হালনাগাদ তালিকা, চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সময়সূচি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

১২. প্রতিটি চা বাগানে ডিডিএল কার্যালয় কর্তৃক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে একজন অভিযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্ধারণ এবং তার নাম দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন, একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন এবং অভিযোগ নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. প্রতিটি বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে পৃথক প্রসবকক্ষ রাখতে হবে, এবং শ্রমিকদেরকে চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসব করানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১৪. প্রতিটি বাগানের শ্রমিকদের শ্রমিক ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার, শ্রমিক ইউনিয়ন ও বিটিএ কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠানে সরকারকে যথাসময়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

১৫. মৃত শ্রমিকের সৎকারের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের একটি বরাদ্দ থাকতে হবে এবং তা সমঝোতা স্বাক্ষরে উল্লেখ করতে হবে।

১৬. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন নামক প্রকল্পের মত আরো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব প্রকল্পে খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রী বিতরণের পরিবর্তে নগদ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। চলমান প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। এছাড়া শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. বাংলাদেশীয় চা সংসদসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনার মাধ্যমে 'চা শিল্পের উন্নয়নে পথ নকশা'টির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

১৮. মালিক কর্তৃক শ্রমিক কলোনীতে যাতায়াতের রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করতে হবে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে তাদের আবাসস্থল সহজ যোগাযোগ উপযোগী স্থানে নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

১৯. বাগানগুলোতে মদের দোকান বন্ধ করতে হবে এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভিযান চালাতে হবে।

২০. বাল্য বিবাহ রোধ করতে বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এ বিষয়ে চা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২১. বাগান কর্তৃপক্ষের অবমাননাকর আচরণ যেমন জুতা খোলানো ও পড়ানো, পঞ্চায়েতদের চেয়ারে বসতে না দেওয়া ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

২২. প্রতিটি বাগানে পুরুষ সর্দার নিয়োগের পাশাপাশি নারী সর্দার নিয়োগ করতে হবে।

-০-